দৈনিক ইনকিলাব

24 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... ৬ ... 1

012-A

# মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিন্যাস ও সমমান বিষয়ক জটিলতা

আহমদ সেলিম রেজা

কথা উঠেছে মাদ্রাসা শিক্ষার সমমান নিয়ে। বির্তকের বিষয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর পূর্ণ বিন্যাস ও সমমান প্রদানের ক্ষেত্রে একটি শায়ত্তশাসিত (মাদ্রাসা) শিক্ষা বোর্ডের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা নিয়ে। কেননা, ১৯৮৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঘোষণায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে প্রচলিত (সাধারণ) শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার একটা তুলনামূলক সাযুজ্য দেখানো হয়। এতে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলাম ও টেকস্ট বুক উইং-এর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী মোতাবেক আলীম ক্লাসকে মাধ্যমিক পর্যায় তথা মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী মোতাবেক এইচ, এস, সি সার্টিফিকেটের সমকক্ষতায় দেখানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টি-হল, উক্ত সার্কুলারে বা তৎপরবর্তী কোন সার্কুলারে ফাজিল বা জমাতে উলা এবং কামিল বা টাইটেল শ্রেণীর শিক্ষামান সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর আওতায় আলীম ক্লাসটি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গ্রহণযোগ্য স্তর মাত্র। এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিন্যাসে এর পরেও আরো দু'টি পৃথক শিক্ষাস্তর বিদ্যমান যা ফাজিল ও কামিল শ্রেণী নামে অভিহিত। সরকারের পূর্বঘোষিত গেজেটে উক্ত শ্রেণী দু'টি "গ্রাজুয়েট এন্ড গ্রাজুয়েট ইন এ্যারাবিক" এই উল্লেখ সহকারে স্বীকৃত। কিন্তু সমস্যা হল শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রদত্ত ১৯৮৫ সালের আলোচ্য সার্কুলারে এ সম্পর্কিত কোন তথ্যই উল্লেখ করা হয়নি। ফলে স্বাভাবিক কারণেই মনের গভীরে একটি প্রশ্ন উকি দিচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষার এই টেকনিক্যাল স্বীকৃতিটি কি তাহলে মাদ্রাসা শিক্ষার নিজস্ব গতিপথে একটি পরিকলিপত নিষেধাজ্ঞা? ব্যাপারটি যদিও এখনই বোধগম্য নয়, তবু বিষয়টি আলোচনার অবকাশ রাখে।

গোড়া থেকেই আলোচনা করা যাক। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ব থেকেই বলতে গেলে বৃটিশ উপনিবেশবাদের যুগ থেকেই এদেশে দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত। একটি ধর্মীয় প্রভাব বর্জিত টোল আর পাঠশালার (পরবর্তীতে স্কুল কলেজের) শিক্ষা অন্যটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষা। বলতে গেলে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষা সেক্টরটি নামে মাত্তর টিকে ছিল। তবে উল্লেখযোগ্য যে, লর্ড ক্লাইভের সরকার রাজনৈতিক ও বিভিন্ন কারণে অবশেষে মাদ্রাসা শিক্ষাকে মুসলমানদের একটি পৃথক শিক্ষা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং সরকারী উদ্যোগে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা বা কলকাতা মোহামেডান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি '৪৭-এর দেশ বিভাগের পর ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা হিসাবে ঢাকার বখশীবাজারে স্থানান্তরিত হয়। আলীয়া মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীতে মূলতঃ এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার পুনর্জাগরণ শুরু হয়। কিন্তু তা আজো মাদ্রাসা শিক্ষাকে একটি সম্মানজনক পর্যায়ে পৌছাতে বা মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে জনমনে কোন জাগরণ আনতে সক্ষম হয়নি। কারণ, এ জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক মূল্যায়ন ও একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে পরিপূর্ণ শিক্ষা কাঠামো গঠন করা, যাতে করে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার শেষ স্তর পর্যন্ত একটানা ১৬ বছরের একটি যুগপোযুগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, অনুমোদন ও প্রবর্তনের ব্যবস্থা থাকবে। বাহ্যতঃ এসব ক্ষেত্রে যদিও সরকারী পৃষ্ঠপোষক তাই বড় কথা, তবু বেসরকারী উদ্যোগ ও চাহিদাই সাধারণতঃ সরকারকে পরিপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সাহায্য করে।

তাই মাদ্রাসা শিক্ষার পূর্ণ মূল্যায়ন, একে একটি পরিপূর্ণ মর্যাদাশীল পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বর্তমানে এ জাতীয় আলোচনা, প্রস্তাবনা, বিশেষ কোন উদ্যোগ ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে ব্রতী হওয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় একটি পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হবে। আর এ জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে বিশেষ কিছু দিক বিবেচনায় রেখে এগুনো উচিত বলে মনে করি। যেমন, প্রথমতঃ মাদ্রাসা শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষার তথা মুসলমানি শিক্ষার একমাত্র বিকল্প মডেল হিসাবে চিহ্নিত করা, দ্বিতীয়তঃ মাদ্রাসা শিক্ষাকে গণ-শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষিতদের সার্বিক মূল্যায়ন তথা মাদ্রাসা শিক্ষিতদের কর্মে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষেত্র প্রস্তুত ও নিশ্চয়তা বিধান করা, তৃতীয়তঃ ১৬ বছরের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা বছর লস না দিয়ে আইন, ব্যবসা প্রশাসন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাসহ শিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যমে সম অধিকারের ভিত্তিতে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করা। যেমন আলিম পাস করেই যেন মাদ্রাসা শিক্ষিতরা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বক্ষেত্রে ভর্তির সুযোগ পায়, নতুবা ফাজিল পাস করে (ডিগ্রী) যদি একজন মাদ্রাসার ছাত্রকে পুনরায় ডিগ্রীতে ভর্তি হতে হয় তবে তার জন্য দুইটি মূল্যবান শিক্ষা বছরের অবমূল্যায়ন হল না কি? এটা রোধ করতে হবে। তবে এটাও ঠিক মাদ্রাসা শিক্ষার স্বার্থের কথা স্মরণে রেখেই এসব ক্ষেত্রে কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপিত হওয়া দরকার। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্মক্ষেত্রের সর্বত্রই একটি কোটা প্রথা প্রবর্তন হওয়া দরকার। নতুবা মাদ্রাসার ছাত্রদের মাঝে মারাত্মক দ্বৈত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ছেলেই আলিম পাস করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বেশী মাত্রায় ঝুঁকে পড়েছে, আবার অনেকে মাদ্রাসার খাতায় নাম রেখেই এটা করছে। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা তার ভাবমূর্তি হারাবে এবং কার্যত মাদ্রাসাগুলো অনেকাংশে অচল হয়ে পড়বে। এতে করে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্চতর পর্যায়টি আর ঘোষণা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে না। তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং ছাত্রের অভাবে উচ্চতর মাদ্রাসাগুলো এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে অথবা অসম্ভব আর্থিক ঝুঁকির সম্মুখীন হবে অথবা বোর্ডের প্রদত্ত মঞ্জুরি টিকিয়ে রাখার শর্তগুলো রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আর এই সবগুলো পর্যায়ই মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য একটি ক্ষতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। এই সময় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে। আমরা মনে করি যে, এমন আশংকা করার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মাদ্রাসা শিক্ষার উচু স্তর দু'টি (ফাজিল ও কামিল) যেন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কোনক্রমেই বন্ধ হয়ে না যায়। দ্বিতীয় চিন্তা করতে হবে যে, কি করে মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চতর স্তর দু'টি স্থায়ীভাবে চালু রাখা যায়।

এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে দু'টি পৃথক বিষয়ে প্রায় একই ভাবনা ভাবতে হবে। সেটা হল, এই স্তর দু'টি বন্ধ হওয়া অথবা সক্রিয় থাকা নির্ভর করছে একটি একাডেমিক সিদ্ধান্তের উপর। এ বিষয়ে আমাদের দেশের একটি পদ্ধতির উপ[র] আলোচনা করা প্রয়োজন। এটি হ[ল]

দৈনিক ইনকিলাব

24 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... ৬ ... 1

012-B

একটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা বোর্ডের সার্টিফিকেট প্রদানে ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। এ বিষয়ে সাধারণ দু'টি বিষয় লক্ষ্য করার মতো: (এক) বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে এদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, (দুই) বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় তার সর্বোচ্চ মান নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড।

মুলতঃ এখানেই মাদ্রাসা শিক্ষার মস্ত বড় ফাঁকা। কেননা, বাংলাদেশের অপরাপর শিক্ষা বোর্ডগুলো কোনক্রমেই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের উচ্চতর কোন সার্টিফিকেট প্রদানের এখতিয়ার রাখে না। কার্যতঃ মাদ্রাসা বোর্ডও তার কোন ব্যতিক্রম নয়। তবুও মাদ্রাসা বোর্ড তার যাত্রালগ্ন থেকেই নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর সকল প্রকার শিক্ষাযোগ্যতারই সনদ দিয়ে আসছে। ফলে মাদ্রাসা বোর্ডের উচ্চতর সনদের কোন কার্যকারিতাই মূলতঃ সমমান শিক্ষা যোগ্যতার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। তাই কামিল পাস সনদ নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সেই বি, এ, শ্রেণী থেকেই আবার অধ্যয়নপর্ব আরম্ভ করতে হয়। ফাজিল পাস করলেও তথৈবচ। অধুনা আলীম পাস করলেই (যেহেতু আলীমকে ইতিমধ্যেই উচ্চ মাধ্যমিক সমমানে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে) আবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তাই পুরো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাই এখন একটা জটিলতায় খাবি খাচ্ছে। আর মাদ্রাসা শিক্ষিতরা এই মানসম্মান নিয়ে ততোধিক বিব্রতকর জটিল ও মর্যাদাহানিকর পরিস্থিতির [illegible]ীন হচ্ছে তার একটি নমুনা চিত্র এইরূপ। যেমন, ১৯৮৭ সালে যারা আলীম পাস করবে তারা উচ্চ মাধ্যমিক মর্যাদা পাবে এবং একই বছর যারা ফাজিল ও কামিল পাস করবে তারাও উচ্চ মাধ্যমিকের সমমান পাবে। এটা কি একটা শিক্ষা ব্যবস্থার মর্যাদার ক্ষেত্রে অপমানকর নয়?

বোধহয় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এসব বিষয় বিচার-বিবেচনা করেই ফাজিল ও কামিল শ্রেণীর জন্য উচ্চতর শিক্ষা সমমান প্রদানে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীগত বাধাটা অতিক্রম করার জন্য উচ্চতর শ্রেণীর সমকক্ষতায় একটি নতুন সিলেবাস প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এটা অবশ্যই আশার কথা। কিন্তু তবু সংশয় থেকেই যাচ্ছে— কতটুকু এগুতে পারবে তারা। কারণ কার্যক্ষেত্রে মাদ্রাসা বোর্ড যদি ফাজিল শ্রেণীর জন্য বিএ স্ট্যাণ্ডার্ড সিলেবাস প্রণয়ন, প্রবর্তন অথবা বাস্তবায়নও করে সেটা কি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন স্বীকার করে নেবে, না-কি বোর্ড সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়ার ব্যবস্থা করবে? আমাদের জানা মতে, মাদ্রাসা বোর্ড কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট মেম্বারশীপও পায়নি। সেক্ষেত্রে সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনেই বোর্ডের যাবতীয় কাজকাম সম্পন্ন হওয়ার কথা। এই বিষয়ে মাদ্রাসা বোর্ড মন্ত্রণালয়ে গিয়েকতটুকু সফলকাম হবে জানি না। তবে এই ধরনের প্রক্রিয়াতে স্থায়ী কোন সমাধানের আশা নেই।

উপরন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাকে এই জটিলতা থেকে মুক্ত করার জন্য আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর কতটুকু নির্ভর করতে পারি এটাও চিন্তা করার কথা। কারণ ফাজিল ও কামিল শ্রেণী সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের চিন্তা-ভাবনা কি তা আমরা জানি না। আমাদের অভিমত, মাদ্রাসা শিক্ষাকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে সর্বাগ্রে যে কোন একটি এফিলিয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কমিশনের স্বীকৃতির প্রয়োজন। কারণ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানেই মাত্র একটি গতিশীল শিক্ষা মাধ্যম গড়ে উঠা সম্ভব। সেক্ষেত্রে আমরা মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ মান নিয়ন্ত্রণ কর্তা হিসাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই বিচেনা করব। কিন্তু এখানেও সমস্যা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এফিলিয়েটেড নয়। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট মেম্বারশীপও পায়নি।

আসলে মুভমেন্ট ছাড়া কিছু হয়নি, কিছু হবেও না। কিন্তু আমাদের সমস্যা হল স্বার্থ না দেখলে আমরা কিছুই করতে আগ্রহী হই না। তাই মাদ্রাসা শিক্ষার এতো বড় বিপর্যয়ের সময়েও তেমন কোন উচ্চবাচ্য শুনি না। আমরা মনে করি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দিয়েও কোন লাভ নেই, যদি না একে এফিলিয়েশন প্রদান করে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তোলা যায়। এক্ষেত্রে স্পষ্টতঃই আমি ফাজিল ও কামিল শ্রেণীকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব করছি। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষাকে টিকিয়ে রাখা ও একে একটি শিক্ষা মাধ্যম হিসাবে সমমর্যাদার আসনে অধিষ্ঠানের আর কোন বিকল্প নেই।

মাদ্রাসা বোর্ডের সিলেবাস প্রণয়নে গোটা মাদ্রাসা শিক্ষার একটি সম্মানজনক অবয়ব প্রতিষ্ঠিত করতে ও তুলনামূলক শিক্ষাগত মান সমমান প্রশ্নে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের বিরম্বনার হাত থেকে রক্ষা করতে নিম্নে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করা হলো:

(১) একজন মাদ্রাসা ছাত্রকে ফাজিল পাস করার পর চাকুরি লাভের জন্য যেন আবার (দু'টি শিক্ষাবছর নষ্ট করে) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী সনদ অর্জনের মুখাপেক্ষী হতে না হয়।

(২) একজন মাদ্রাসা ছাত্র ফাজিল (ডিগ্রী) পাস করার পর সরাসরি যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা মাদ্রাসার এমএ অথবা কামিল শ্রেণীতে যেনো ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা সংরক্ষণ করতে পারে।

(৩) ফাজিল সিলেবাস যেন তুলনামূলকভাবে প্রচলিত শিক্ষামানের ডিগ্রী (গ্রাজুয়েট) মর্যাদাসম্পন্ন হয়।

(৪) প্রতিটি ফাজিল পাস ছাত্রের জন্য বিসিএস প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত করা যায়।

(৫) বিশেষত একজন ছাত্রকে যেন অধ্যয়ন করতে গিয়ে নাম্বারের বোঝা অথবা কিতাবের বোঝায় বিভ্রান্ত হতে না হয়।

এই সকল প্রস্তাব বিচার-বিবেচনা করে মাদ্রাসা বোর্ড যদি আপাতত একটি সিলেবাসের তুলনামূলক রূপরেখা গ্রহণ করে, আমাদের বিশ্বাস তাহলে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার বিএ মানের সাথে তুলনা করে ফাজিল শ্রেণীর একটি সিলেবাস ও মাপকাঠি প্রস্তুত সম্ভব হবে।